International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-IV, July 2023, Page No.29-36
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i4.2023.29-36

আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাত দাস
সহকারী অধ্যাপক, নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
We all know Rabindranath Tagore, but another identity of the poet remains hidden in the public eye, which is that he is a skilled social organizer. The poet visited the ancestral zamindari where he collected various materials of literature in close proximity to the villagers and nature, as well as participated in the removal of their lack of life, misery, poverty, illiteracy superstitions. He expected the joys and comforts of their lives till death. The key to India's development is in the village, so the welfare of the people of India is not possible if the overall welfare of the village is not done. That is why he planned Patisar, Kaligram, and Sriniketan. To increase production by introducing advanced agricultural system for the common people, to provide agriculture in cooperative policy, to arrange for the sale of agricultural products, to organize animal husbandry, to build agricultural farms, to promote agro-based industries, to establish schools, to establish health centers, to establish libraries, gymnasiums, playgrounds, fairs, to deal with natural disasters, to build roads, to establish cooperative banks, to prevent malaria, etc. He did. Rabindranath Tagore's village plan seems relevant and up-to-date in the context of the present time.

Key word: Rabindonath Tagore, Village plan, social work, Education, Sriniketan

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে আমরা সবাই জানি কিন্তু কবির অন্য আরেকটি পরিচয় লোকমানসে লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গিয়েছে তা হল তিনি একজন দক্ষ সমাজসংগঠক। কবি শিলাইদহ,সাজাদপুর,পতিসর কালীগ্রামে পৈতৃক জমিদারি পরিদর্শনে গিয়েছেন সেখানে গ্রামবাসী ও প্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ যেমন সংগ্রহ করেছেন, সেইসঙ্গে তাদের জীবনের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য, অশিক্ষা কুসংস্কার মোচনেও স্বহৃদয় অংশগ্রহণ করেছেন। আমৃত্যু তিনি তাদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করেছেন। সুদীর্ঘ ৪০ বছর কবি সাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ভারতবর্ষের উন্নতির মূলচাবিকাঠি রয়েছে গ্রামে তাই গ্রামের সার্বিক কল্যাণ না করতে পারলে ভারতবাসীর মঙ্গল সম্ভব নয়। সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নয়নের স্বদিচ্ছা থাকলেও তিনি তা করতে পারবেন না; কিন্তু একটা আদর্শ স্থাপন করতে পারেন। সেইজন্যই তিনি পতিসর, কালীগ্রাম, শ্রীনিকেতনে পরিকল্পনা করেছিলেন। সাধারণ জনগণের জন্য উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, সমবায় নীতিতে কৃষিকাজের ব্যবস্থা করা, কৃষিজপণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা, পশুপালন, কৃষিখামার তৈরী, কৃষিনির্ভর শিল্পের

প্রসার,কুটীর শিল্পের প্রসার, বিদ্যালয় স্থাপন,স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, গ্রন্থাগার, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, মেলার আয়োজন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা, রাস্তাঘাট নির্মাণ,সমবায় ব্যাংক স্থাপন, ম্যালেরিয়া ওলাওঠা প্রভৃতি রোগ নিবারণের চেষ্টা, দুর্ভিক্ষ নিবারণের গ্রামীণ ধর্মগোলা স্থাপন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। কবি তাই গ্রামীণ জীবনধারার সামগ্রিক উন্নয়ণে গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও ক্ষুদ্র-মাঝারী শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল; বর্তমান সময়েও সরকারীভাবে গ্রামের কৃষি ব্যবস্থা ও কুটির শিল্প প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছে,গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর চেষ্টা করা হচ্ছে, বিভিন্ন NGO ও সরকারী সাহায্যকল্পে ঋণ দেওয়া হচ্ছে,এমনকি গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে অবসর সময়ে ক্ষুদ্রশিল্পে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামপরিকল্পনা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক জমিদারি বর্তমান বাংলাদেশের শিলাইদহ, সাজাদপুর,পতিসর ও কালীগ্রামে। ১৮৯০ সালে ২৫ শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি দায়িত্ব গ্রহণের পর শিলাইদহ যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী তার এক সহচরী কন্যা বেলা ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং ভাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে। জমিদারিতে কবির মন ছিল না সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধ ও ছিল না। তিনি লিখেছেন – "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি।... এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক সে প্যারাসাইট্, পরাশ্রিত জীব। ... প্রজারা অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয় – এর মধ্যে পৌরুষ ও নেই, গৌরব ও নেই।"[১] জমিদারি প্রথায় যে সমস্ত নিয়ম কানুন ছিল রবীন্দ্রনাথ তাতে পরিবর্তন আনলেন। সাধারণ প্রজা যেন জমিদারের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রজাদের নিকট সান্নিধ্যে এসে তাদের সুখ-দুঃখ অভাব আভিযোগের কথা শুনলেন দরদী জমিদার রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ সালে শিলাইদহ থেকে লিখেছেন – "আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরুপায় - তিনি এদের মুখে নিজে হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।"[২] কবি জমিদারির দায়িত্ব পেয়ে শিলাইদহে অরাজকতা প্রত্যক্ষ করেন। এককালে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের অত্যাচার পরে সেরেস্তাদারদের অবিবেচনা অন্যায় প্রজাপীড়ন কবিকে ভাবিত করে। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি প্রতাপ ও অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বলেন। এই স্বাস্থ্য সম্পদহীন অজ্ঞ মানুষদের আত্মশক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন -

"... এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা এইসব শান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"[৩]

দীর্ঘ অবহেলায় শোষণে বঞ্চনায় যারা হীনবল তাদের আত্মমর্যাদাবোধে জাগ্রত করা, শক্তি সমবায়ে উদ্বোধিত করা সহজ কাজ নয়। আমিও পারি এই বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। সমাজে যারা উচ্চকোটিতে অবস্থান করছেন তাঁরা গরীব গ্রামবাসীদের এদেশের লোক বলে মনে করতেন না; স্বভাবতই তৈরী হয়েছে দুরত্ব যা পরস্পরকে বিমাতৃসুলভ আচরণ করতে উৎসাহিত করে। কারণ কবি বলেছেন – "গ্রামের যে মুর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মোকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে টা চোক্ষে দেখেছি।"[৪]

১৯০৮ খ্রি; পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। দেশ স্বায়ত্বশাসনে উৎসাহিত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় মন্ডলী প্রতিষ্ঠা, শিক্ষায়তন, ধর্মগোলা, সমবায় বিপণি,সমবায় ব্যাংক, কারুশিল্প ও বিপনন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদ সালিশের মাধ্যমে সমাধান করবে। প্রত্যেক মন্ডলীতে একটি সাধারণ মন্ডপ গড়ে সেখানে সাহিত্য আমোদ করা হবে। গ্রামের ক্ষুদ্র চাষিদের টুকরো টুকরো জমিতে চাষের খরচ প্রচুর, তাই যদি মন্ডলী স্থাপন করে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্ত জমিতে একত্রে চাষ করা যায় তবে খরচ অনেক কম হবে। কৃষিনির্ভর দেশে কৃষির উন্নতি করতে না পারলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ চন্দ্রকে কৃষি ও পশুপালনবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য আমেরিকা পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ একটি বা দুটি গ্রামের পূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন - "আমার প্রস্তাব এই যে,বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য,তার পাঠশালা,তার সাহিত্য চর্চা ও আমোদ-প্রমোদ, তার রোগী পরিচর্চা ও চিকিৎসা,তার বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি।"[৫] প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ম্ভর হোক এই প্রত্যাশা নিয়ে শিলাইদহ,পতিসর,কালীগ্রামে ও সর্বপরী শ্রীনিকেতনে গ্রামপরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজ গঠনের উদ্দেশ্যকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন-

১. "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব - সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।
২. সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ - বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।
৩. স্বদেশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প উন্নতির চেষ্টা।
৪. উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।
৫. বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্ব ধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।
৬. প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ পথ্য সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।
৭. পানীয় জল, নদীনালা,পথঘাট,সৎকার স্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।
৮. আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গোমহিষাদির পালন দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।
৯. দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।
১০. গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন,তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১. সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।
১২. মিলন মন্দির ক্লাব স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।
১৩. পল্লীর তথ্য সংগ্রহঃ অর্থাৎ, জনসংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষ,বালক-বালিকার সংখ্যা বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহ সংখ্যা জন্ম-মৃত্যু সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থান ত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা,কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি অবনতি, বিদ্যালয় পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাওঠা বসন্ত অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।
১৪. জেলায় জেলায়,পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও ঐক্য-সংবর্ধন।
১৫. জেলা সমিতি,প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্যের সহায়তা করা।”[৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ সাজাতপুর পতিসর কালিগ্রামে পৈত্রিক জমিদারিতে মন্ডলীপ্রথা প্রবর্তন করে সেখানে হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে পল্লিউন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রামের অশিক্ষিত বঞ্চিত আত্মবিশ্বাসহীন ব্যাক্তিদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে কবির এই সাধনা। রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন সংগঠক ছিলেন তা কবির কর্মপ্রচেষ্ঠায় ধরা পড়ে। কবি বন্ধু জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসুকে লিখেছেন – “ আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লীগঠন কার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করার চেষ্টা করছে। তাদের দিয়ে রাস্তা ঘাট বাঁধানো,পুকুর খোঁড়ানো,ড্রেন কাটানো,জঙ্গল সাফ করানো প্রভৃতি কাজের উদ্যোগ হচ্ছে।“[৭] একটি আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রামের জনসাধারণকে সংগঠিত করতে কালীচরনকে দিয়ে কবি কাজ শুরু করলেন। শান্তিনিকেতন থেকে সতীশচন্দ্র রায়ের ভাই ভূপেশ চন্দ্রকে শিলাইদহে পল্লীপুনর্গঠনের জন্য নিয়ে আসেন। ভূপেশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন পূর্ববঙ্গের কিছু তরুণ কবিকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন। গ্রামীণ চাষীদের আত্মশক্তিতে দৃঢ় করতে হবে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। সেই সঙ্গে কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে রায়ত মহাজন ও কাবুলিওয়ালাদের থেকে দরিদ্র চাষীদের রক্ষা করতে হবে। পল্লীসমাজ গঠন করতে হবে শহর গ্রাম কী পল্লীনিবাসী সকলেই পল্লীসমাজভূক্ত হবেন পল্লীসমাজের কাজ স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। গ্রামীণ বিবাদ ঝগড়া সালিশের দ্বারা মীমাংসা হবে এতে গ্রামীণ জন সাধারণ বিপূল অর্থহানি থেকে রক্ষা পাবেন। বিদ্যালয় স্থাপন চিকিৎসালয় স্থাপন,পানীয় জল,পথঘাট সংস্কার,ব্যায়ামাগার ক্রিয়াক্ষেত্র স্থাপন গ্রামীণ ক্রীড়াক্ষেত্র স্থাপন উন্নত কৃষিক্ষেত্র স্থাপন জীবিকার সুবন্দোবস্ত করা। দুর্ভিক্ষ নিবারণে ধর্মগোলা স্থাপন গৃহস্থ স্ত্রীলোকদের উপার্জন বৃদ্ধি করতে কুটীরশিল্প স্থাপন, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের উপর নিষেধাক্কা জারি ক্লাব সভা সমিতি স্থাপন প্রভৃতি জনকল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহণ। “ ... ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ট পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে নিচের দিক দিয়ে। ...আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারিনি। কিন্তু এই কথা মনে রেখো,পাবনা কনফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতি প্রচার করে এসেছি।”[৮] কবির ভাবনা কত বাস্তবমুখী ও সুপরিকল্পিত ছিল তা জানা যায় কবির শ্রীনিকেতন পরিকল্পনায়। শ্রীনিকেতনে কবি হাতে কলমে কৃষি অনুশীলন করেছেন।

ভারতবাসীর শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন কীভাবে করা যায়, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন থেকে তাই গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। গান্ধীজি গঠনমূলক কাজ ও সেবা ব্রতের ভিতর দিয়েই সমগ্র ভারতবর্ষকে স্পর্শ করেছিলেন। তাই ভারত তাকে জাতির জনক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতবাসী ক্রমশ আত্মশক্তি হারিয়ে পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিনত হচ্ছে। গান্ধীজির মতো রবীন্দ্রনাথ ও চেয়েছিলেন গ্রাম সমাজ স্বয়ম্ভর হোক। আমাদের জীবনধারণের জন্য যে সব উপকরণ অত্যাবশ্যক সে সব উপকরণ গ্রামেই উৎপন্ন হোক। রবীন্দ্রনাথের মতে গ্রাম নিজেকে দেশের জন্য সমর্পন করবে দেশ বিশ্বের জন্য। গান্ধীজি দেশকে প্রস্তুত করেছিলেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাতীর্থের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনে বিলেতী দ্রব্য বর্জন নীতি, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ত্যাগ, ইংরাজি শিক্ষা বর্জন ইত্যাদি প্রচার চলছে। সমগ্র বিশ্বকে একটা নীড় হিসাবে গড়তে চাইছেন কবি তাই ব্যথিত হচ্ছেন গান্ধীজির এমন সিদ্ধান্তে। গান্ধীজির চরকা নীতিকে ও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। চরকায় হাত চলে মন চলে না। গান্ধীজির সেবাগ্রাম আশ্রম প্রাঙ্গনে লেখা ছিল – " ইস গাওমে পরিপুষ্ট বিশ্বকা দর্শন হো।" আর কবির আশ্রমের আদর্শ 'যত্র বিশ্বম্ ভবেত্যেকনীড়ম্।' 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমি সমগ্র ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি গ্রাম। সেই মানসিকতা নিয়েই গ্রাম পরিকল্পনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কৃষিনির্ভর দেশে কৃষির উন্নতি করতে না পারলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে কৃষি ও পশুপালন বিদ্যা শিক্ষা করতে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ চন্দ্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে শিলাইদহে ফেরেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাজ বুঝিয়ে দেন। কৃষি বিজ্ঞানবিদ রথীন্দ্রনাথ বলেছেন –" বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ি সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করলুম। ...আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টাবীজ আনালুম। চাষিদের আলু ও টমেটো চাষ শেখানো হল। শিলাইদহে দো-আঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি সামগ্রির অভাব তা জানাবার জন্য ছোট খাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরি গড়ে তুললুম।"[৯] নতুন উন্নত কৃষিপদ্ধতিতে চাষ করে চাষীরা লাভবান হল। অবিকৃত মাছ কচুরীপানা থেকে সার করে তা জমিতে ব্যবহারের অভিনব ব্যবস্থা করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পতিসরে বন্যার্তদের জন্য টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই টাকার উদবৃত্ত টাকা দিয়ে আত্রাইয়ে একটি খাদি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন সেইসঙ্গে কয়েকটি ট্র্যাক্টর ও কেনা হয়। চালক না পেয়ে রথীন্দ্রনাথ নিজে ট্র্যাক্টর চালিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ১৯১০-১৯১৮ পল্লীউন্নয়ন কাজে ডুবেছিলেন,কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ,নানা কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রজাহিতৈষী সভা, সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষার বিদ্যালয় গঠন,জমির জন্য অভিনব সারের উদ্ভাবন ও প্রচলন, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিঋণ দান প্রভৃতি কাজে পিতার পল্লীউন্নয়ন আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

কালিগ্রামে রথীন্দ্র ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্টিত হয়েছিল যা পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী লাভ করেছিল। পতিসরে হাইস্কুলে ছাত্র ভরে গিয়েছে তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে কাজ ভালো চলছে। মামলা মোকদ্দমা গ্রামীণ সালিশি সভায় প্রধানরা মিটিয়ে দিচ্ছেন। কামার,কুমোর,তাঁতি, স্বচ্ছন্দে তাদের কাজ করছেন। ভারতবর্ষে এমন বিদ্যালয় স্থাপিত হবে যেখানে অর্থাশাস্ত্র,কৃষিতত্ত্ব,স্বাস্থ্যবিদ্যা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে পল্লীগ্রামে প্রয়োগ করে জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করবে। এই বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করবে,গোপালন করবে,কাপড় বুনবে,সমবায় করে সকলে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হবে। এইরূপ আদর্শ

বিদ্যালয় স্থাপন করতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করার জন্য রবীন্দ্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ,সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, গৌড়গোপাল ঘোষ ও লেনার্ড নাইট এল্মহাস্ট মিলিত হয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেন। বিশ্বভারতীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শ্রীনিকেতন, আচার্য হবেন রবীন্দ্রনাথ এল্মহাস্ট হবেন ডাইরেক্টর বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সভাপতি রথীন্দ্রনাথ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। এখানে শেখানো হবে পোলট্রি,মৌমাছি পালন,ডেয়ারী গাভী ও ছাগল পালন বাগান শাকসব্জি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ দারুশিল্প শিক্ষা ও ধাতু শিল্প। সেইসঙ্গে গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত, নিকাশী ব্যবস্থা কার্যকরী রাখা, পুকুর সংস্কার ও খনন করা গ্রামের অবাঞ্ছিত জঞ্জাল মুক্ত করা। কুষ্টিয়াতে তিনটি স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেইসঙ্গে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। কৃষকদের অবসর সময়কে কাজে লাগাতে বয়নশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন - " আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দ্বৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা,ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা,জানার দ্বারা,বোঝার দ্বারা সম্পূর্ন আত্মীয় করে তুলিনি - একে অধিকার করতে পারিনি।... আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়।"[১০] কবির প্রকৃত দেশাত্মবোধকে বুঝতে আরেকটি দৃষ্টান্ত দেব। কবি দেশের কাজ সম্পর্কে ১৯৩২ সালে বলেছেন - " আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন মন প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে।"[১১]

আমরা যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন না হই তবে আমাদের প্রকৃত উন্নতি হবে না। ভিক্ষায় স্থায়ী কিছু উন্নতি সম্ভব নয়। অন্নসমস্যা,জলসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা লোকসাধারণকে নিজেদের-ই সমাধান করতে হবে। কবি জমিদারীতে প্রায়শই ঘরবাড়ি পুড়তে দেখেছেন। তিনি গ্রামবাসীকে কূপ খুড়ে দিতে বলেছেন তিনি তা বাঁধিয়ে দেবেন কিন্তু গ্রামবাসী তা করেনি। কবির মনে করেন গ্রামীণ জনকল্যাণ সাধনের প্রতিবন্ধকতা অনেক - "আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর উপকার অতি সহজেই করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না- ছোটো হইতে হইবে,ছোটোর সমান হইতে হইবে।"[১২] বাইরে থেকে সাহায্য করতে চাইলে অহং আসতে পারে সেই সঙ্গে গ্রামবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। গ্রামবাসীরা যদি কবিকে তাদের নিজের লোক বলে মনে করেন তাবে কবির হাত থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতে তাঁদের কিছুমাত্র আপত্তি থাকার কথা নয়। কবিকে তাই গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে নেমে আসতে হবে।

ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ ভারতের উন্নয়ন গ্রামকে বাদ দিয়ে হতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ তাই শিক্ষাসংস্কার, সমাজ সংগঠন ও সংস্কৃতির উত্তরণ নিয়ে এই পল্লীর বুকে তাঁর জীবনের মহামূল্য চল্লিশটি বছর সাধনায় কাটালেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালে ১৫ই নভেম্বর একটি চিঠিতে লিখেছেন -" শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।"[১৩] শান্তিনিকেতনে জ্ঞানের চর্চা শ্রীনিকেতনে কর্মের চর্চা। শিক্ষার কল্যানেই পশ্চিমের দেশের মানুষ অনেক সংবদ্ধ তাই শক্তিশালী। তাই তারা সরকারের কাছে ভিক্ষা চায় না দাবী জানায়। সাধারণ মানুষের দুঃখ তাই একার দুঃখ অশিক্ষার দ্বারা তারা বিচ্ছিন্ন। এই নিরাশার অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসাই শ্রীনিকেতনের সাধনা। শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র জ্ঞানের সাধনা নয়,জ্ঞানের সাধনা অনুভূতির বা সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পবৃত্তির সাধনা, কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সাধনা একেই

কবি সর্বাঙ্গীন শিক্ষা বলেছেন। শিক্ষা বলতে তিনি ডিগ্রিমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেননি,শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশকেই মুখ্য বলে মনে করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে এসব নীতি পরিক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ ঘটান। প্রথম থেকেই কবি শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন বৃত্তি শিক্ষাই শেষকথা নয় পরিপূর্ন মনুষ্যত্বের শিক্ষাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন মধ্যবিত্ত সাধারণ ভারতবাসী ক্রমেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। নিজেদের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মবিশ্বাস আত্মনির্ভরতা তথা আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে পরনির্ভর জাতিতে পরিনত হচ্ছে। হৃতসর্বস্ব গ্রামীণ মানুষগুলিকে মানুষের মর্যাদায় করার একমাত্র পথ যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এই যথার্থ শিক্ষাটা কী? এ শিক্ষা স্কুল কলেজের তথাকথিত শিক্ষা নয় এ শিক্ষা একেবারেই প্রাথমিক ব্যাপার। লিখতে পড়তে পারবে খবরের কাগজ পত্র-পত্রিকা তাদেরকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। সর্বপরি নিজের পাওনা গন্ডা বুঝে নিতে পারবে। মানুষ অজ্ঞতার দ্বারাই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "শ্রেষ্টত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষের এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ মেলার আয়োজন করেছেন,মেলায় আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হব আমাদের মধ্যে সৌভাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠবে। আনন্দমেলার জন্য কুটির শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন যেখানে কামার, কুমোর,তাঁতি, ছুতোর সকলকে আহ্বান করেন উৎপাদিত সামগ্রী প্রদর্শন করতে পারেন। সেই মেলায় কুস্তিগীররা তাদের কসরত প্রদর্শন করলেন। যাত্রা, কবিগান, থিয়েটার, তর্জা, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের জনগন মেলার দায়িত্ব পালন করলেন। সেই মেলায় আচার্য জগদীশ চন্দ্র ও নাটোর রাজ জগদিন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

সমাজকর্মী রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি অঞ্চলকে নিয়ে এক গ্রামীণ ভূবন রচনা করেছেন। গ্রামের সার্বিক উন্নয়ণ ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে তিনি সদা তৎপর। ১৯০৫ খ্রী; পাতিসরে সমবায় ব্যাঙ্ক ভিত্তিক কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফলে দরিদ্র রায়ত মহাজন ও কাবুলিওয়ালাদের থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। নোবেল পুরষ্কারে প্রাপ্ত টাকার ৭৫ হাজার টাকা এই ব্যাঙ্কে জমা করেন। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের অনেক দেশে দেখেছেন তারা সমবায় পদ্ধতিতে স্বয়ম্ভর হয়েছেন- "আমার কাছে মনে হয়,এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।"[১৫] রথীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্যাংক খোলার পর বহু গরীবপ্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণ মুক্ত হবার। কুড়ি বছর চলেছিল ব্যাংক তারপর রবীন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়।

কবি, শিল্পী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ কেন গ্রামউন্নয়ন ও পল্লীসমাজ গঠনে সময় ও অর্থ ব্যয় করলেন কী প্রয়োজন ছিল হতশ্রী সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামসমাজকে ভেঙ্গে গড়ার দায়িত্ব নেবার? দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য নতুন নতুন অর্থকরী দিক খুলে দেওয়ার চেষ্টাই ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের অন্যতম কারণ। তিনি একক কোনো শ্রেনী বা ব্যক্তির হাতে বিপুল ধনসম্পত্তির তীব্র বিরোধিতা করেছেন,তবে কেন তিনি জমিদারি ত্যাগ করলেন না, তিনি উপলব্ধি করেছেন তিনি জমিদারি ত্যাগ করলে একটা নতুন জমিদার শ্রেনীর উদ্ভব হবে। তিনি মনে করেন গ্রামবাসীদের মনকে পেতে হবে,তাদের সঙ্গে একত্র কাজ করার শক্তি অর্জন করতে

হবে নইলে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রবীন্দ্র কবিতায়,বিশেষ বক্তৃতায়, অভিভাষণে,চিঠিপত্রে গদ্য রচনায় নতুন সমাজ গঠনের পরিকল্পনায় কবি বারংবার বলেছেন 'আমি তোমাদেরই লোক'। রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই উদার মানবিক চেতনা কবিকে দক্ষ পল্লীসংগঠকে পরিণত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ছিন্নপত্র ৮১ নং পত্র।
২. ছিন্নপত্র ৯৫ নং পত্র।
৩. চিত্রাকাব্য 'এবার ফেরাও মোরে'২৩ ফাল্গুন ১৩০০।
৪. ১৩৩৭ সালে শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসিদের নিকট কথিত (ভাষণ) -রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ ম খন্ড জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা পঃবঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পৃ -৭৩৮।
৫. পল্লীরউন্নতি, পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খন্ড জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ পঃবঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ -৫০৫।
৬. রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খন্ড, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত,পৃ - ৭৭৮।
৭. প্রশান্ত কুমার পাল রবিজীবনী ৫ ম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৩৯৫,পৃ-৩৯৪।
৮. পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ -৫৮২।
৯. পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর,পৃ-২১৩।
১০. রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত,কালান্তর,১৩শ খন্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পৃ- ৩৭১ দেখতে হবে।
১১. দেশের কাজ পল্লীপ্রকৃতি ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ পৃ ৫২৬।
১২. লোকহিত, কালান্তর,রবীন্দ্র রচনাবলী,জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ - ২২২-২২৩।
১৩. পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ-৫৮২।
১৪. পল্লিপকৃতি, ১৯৪০ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী বার্ষিক উৎসবে কথিত রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩ খন্ড,প,ব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পৃ-৫৪৫।
১৫. সমবায় নীতিঃ সমবায় -১,রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খন্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ পৃ- ৪১৮।

গ্রন্থঋণ:

১. আহমদ রফিক, রবীন্দ্রভুবনে পতিসর, কথা প্রকাশনী, কলকাতা।
২. চট্টোপাধ্যায় তপন কুমার, ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী,প্রজ্ঞাবিকাশ,২০০৯ কলকাতা।
৩. দত্ত হীরেন্দ্রনাথ,অচেনা রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ কলকাতা।
৪. দত্ত অমিতাভ, রবীন্দ্রসাহিত্যে ও কর্মে লোকসাধারণ, ২০০৪ পুস্তকবিপণি, কলকাতা।
৫. চৌধুরী সাইফুদ্দিন পতিসরে রবীন্দ্রনাথ,জানুয়ারী ২০০০ দে'জ পাবলিকেশন,কলকাতা।
৬. পাল প্রশান্ত কুমার রবিজীবনী তৃতীয় খন্ড (১২৯২-১৩০০) আনন্দ পাবলিশার্স ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ কলকাতা।
৭. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৪, কলকাতা ১৪০১।